গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩০ জানুয়ারি ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিদ্যুৎ কমিশনের শুনানিতে

রাজ্য সরকারের নজিরবিহীন দ্বিচারিতা

আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার মনোনীত রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের জন্য গত ২০০১ সালের ৭ নভেম্বর যে বর্ধিত মাশুল হার ঘোষণা করেছিল, সকলেই জানেন, সেই বর্ধিত মাশুলে সন্তুষ্ট হতে না পেরে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের ইন্ধনে সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আরও মাশুল বাড়াবার জন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। সেই মামলায় প্রধান বিরোধীপক্ষ ছিল অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। মামলাটি হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে নতুন মাশুল হার নির্ধারণ করতে বলে। ঐ রায়ের অপব্যাখ্যা করে রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন কোন শুনানি না করেই ২০০২ সালের ১১ নভেম্বর উপরোক্ত দু বছরের জন্য নতুন করে গড় মাশুল ইউনিট প্রতি যথাক্রমে ৩৮১ পয়সা ও ৩৯০ পয়সা হারে ঘোষণা করে দেয়। তারপর ১৬ ডিসেম্বর '০২, বিভিন্ন হারে মাশুল নেওয়ার যে স্ল্যাব প্রথা ছিল, তাকে সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে সকল প্রকার গ্রাহকদের জন্য একই মাশুল হার যথাক্রমে ৩৮১ ও ৩৯০ পয়সা ঘোষণা করে। এটা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে করা হয়নি, পশ্চিমবঙ্গেই সর্বপ্রথম করা হয়। এর ফলে এক ধাক্কায় গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিদ্যুৎ মাশুল ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ১০০ ইউনিটের ক্ষুদ্র গ্রাহকদের বিদ্যুৎ মাশুল দাঁড়ায় ৩৯০ টাকা।

এই আক্রমণের মোকাবিলায় আবার শুরু হয় আন্দোলন। এস ইউ সি আই এবং অ্যাবেকা'র ডাকে বাংলা বন্‌ধ, লাগাতার বিল বয়কট আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ। তখন ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন। গোয়েঙ্কার সি ই এস সি এবং রাজ্য সরকার জনরোষের চেহারা দেখে কমিশনের রায় চালু করতে ভয় পায় এবং আদালতের আশ্রয় নেয়। ১৬ ডিসেম্বরের অভিন্ন মাশুল ঘোষণার বিরুদ্ধতা করে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে মামলা করে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

সিপিএম-সিপিআই-এরও নৈতিক অধিকার নেই নেতাজিকে মাল্যদান করার

২৩ জানুয়ারি মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সিপিএমের আকস্মিক তৎপরতা জনমনে বহু প্রশ্ন তুলেছে। নেতাজির প্রতি চরম অশ্রদ্ধা দেখানো এবং '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে জনগণ কর্তৃক ধিক্কৃত সিপিএম নেতৃত্ব ২৬ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এই প্রথম, ভোটের মুখে হঠাৎ দশ হাজার মোটরবাইকের র‍্যালি ও আলোক সজ্জা সহ বহু টাকা ব্যয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নিয়েছিল।

'৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নেতাজিকে 'ফ্যাসিস্ট' এবং জাপানি সমরনায়ক 'তোজোর কুকুর' হিসাবে কার্টুন এঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার অপরাধে সিপিআই-সিপিএম নেতাদের ধিক্কার দিয়েছে, ঘৃণা করেছে দেশের মানুষ। '৭৭-এ ক্ষমতায় বসে 'নেতাজির মূল্যায়নে' আমাদের ভুল ছিল' বলে কপট 'ভুল স্বীকারের' ছলনায় তাঁরা দেশের মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েছেন। 'নেতাজির প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করা উচিত হয়নি', 'আমরা দলের দলিল সংশোধন করেছি' — এমন আপাত স্বীকারোক্তির আড়ালে তাঁরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো আসল প্রশ্ন — তাদের 'ভুলের' শ্রেণীচরিত্রকেই আড়াল করার চেষ্টা করেছেন।

কী সেই ভুল, কী সেই ভুলের চরিত্র, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কী করেছিল, কী ন্যক্কারজনক ছিল হিন্দুত্ববাদী ধর্মধ্বজীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বহুকাল আগেই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ সঠিক ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সেই শিক্ষা ও ব্যাখ্যার আলোকে গত ২১ জানুয়ারি এস ইউ সি আই আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে পঃবঙ্গ

সাতের পাতায় দেখুন

প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজি ফিরিয়ে আনল সরকার

গরিবের শিক্ষার স্বার্থে নয়

দীর্ঘ ২৬ বছর বাদে এ' রাজ্যের প্রথম শ্রেণীতে আবার ইংরাজি পড়ানো শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই সরকারি নীতি কয়েক কোটি শিশুর ইংরাজি শিক্ষার বনিয়াদটা নড়বড়ে করে দিয়েছে। বহু বছরের টালবাহানার পর এই নতুন সরকারি সিদ্ধান্তের কারণ সম্বন্ধে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন যে, তাঁদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এও বলেছেন, একসময় শিক্ষাবিদদের সিদ্ধান্ত মেনে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি তুলে দেওয়া হয়েছিল; এখন আবার শিক্ষাবিদদের পরামর্শেই তা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ভাবখানা এমন, যেন ছাত্রস্বার্থের কথা ভেবেই তাঁদের যাবতীয় কার্যকলাপ। অথচ ২৬ বছরের সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে যে কী হাল হয়েছে তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

শিক্ষা — যাকে বলা হয় গণতন্ত্রের ভিত্তি, যা ছাড়া সভ্যতা একতিলও এগোতে পারেনা, মানবসভ্যতা টিকে থাকতে পারেনা — তা নিয়ে চলেছে চরম ছিনিমিনি খেলা। যে রাজ্য একদা শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হত — তা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান চিত্রটা বুঝতে কিছুটা সহায়তা করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এরাজ্য শিক্ষায় ছিল দ্বিতীয় স্থানে। বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় এল — তখন ছিল নবম স্থানে। বর্তমানে তা এসে পৌঁছেছে অষ্টাদশ স্থানে। এ রাজ্যে প্রাথমিকের পাঠ সাঙ্গ হওয়ার আগেই শতকরা ৭৮ জন ছেলেমেয়ে শিক্ষার গণ্ডি থেকে ছিটকে যায়, অর্থাৎ ড্রপ আউট হয়। প্রাথমিকের পাঠ শেষ অর্থাৎ ৪র্থ শ্রেণীর পড়া সাঙ্গ করাই

তিনের পাতায় দেখুন

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে বিশাল ছাত্র সম্মেলন

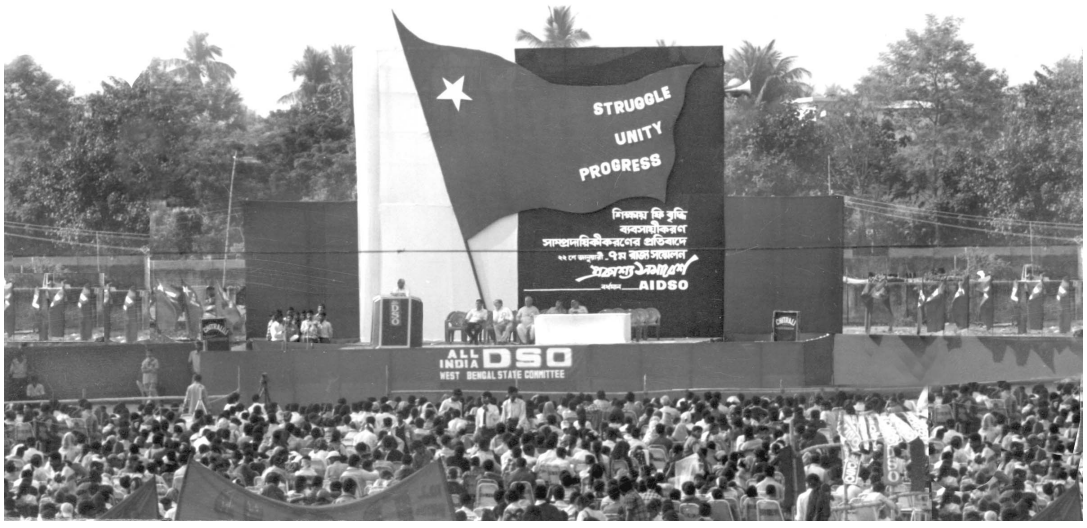

এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ২২ জানুয়ারি বর্ধমানের সার্কাস ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে ১৫ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী যোগ দেয়।

(সংবাদ আগামী সংখ্যায়)

বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির ডাকে বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণডেপুটেশন

২২ জানুয়ারি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক সমবেত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার জন্য। সাথে ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রাহকের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র। দাবি ছিল বিদ্যুতের বর্ধিত সিকিউরিটি ও মাশুল প্রত্যাহার, জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল, খামখেয়ালিভাবে লাইন কাটা বন্ধ, অভিন্ন মাশুল নীতি প্রত্যাহার, ১ টাকা ইউনিট দরে ক্ষুদ্র গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। কিন্তু স্মারকলিপি নিতে রাজি হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। এমনকি অন্য কোনও মন্ত্রী বা তাঁদের সচিবরাও জনসেবায় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, লক্ষাধিক স্বাক্ষর সহ কয়েক হাজার মানুষের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে সময় নষ্ট করতে রাজি নন তাঁরা। জনস্বার্থ বা জনসাধারণের প্রতি মন্ত্রীদের দায়িত্ববোধ কতখানি তা যেমন দেশের মানুষের অজ্ঞাত নয়, তেমনি গ্রাহক সমিতিরও তা অজানা ছিল না। তাই সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস রানী রাসমণি রোডে ঘোষণা করেন যে, "আমরা পুলিশকে পনের মিনিট সময় দিচ্ছি, তাতে যদি তাঁরা কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন ভালো, নচেৎ আমরা আইন অমান্য করতে বাধ্য হব।" বিক্ষোভকারীদের সংগ্রামী তেজ, দৃঢ়তা ও লড়াকু মানসিকতা দেখেই সম্ভবত পুলিশ প্রমাদ গোণে। পুলিশ কর্তারা তৎক্ষণাৎ রাইটার্সে যোগাযোগ করে জানান — স্মারকলিপি নিতে রাজি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব। সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস, সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলী এবং প্রদ্যুৎ চৌধুরী, মধুসূদন মান্না ও অধ্যাপক অমৃত খালিং প্রমুখ স্মারকলিপি প্রদান করেন।

কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হওয়া কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহকের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সুদূর কালিম্পং থেকে শুরু করে হুগলি, মেদিনীপুর সহ রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মিছিল রাণী রাসমণি রোডে পৌঁছলে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা সেখানে বক্তব্য রাখেন। সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বিচারিতার পথ নিয়েছে। মুখে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-র বিরোধিতা, আর ভিতরে ভিতরে অতি দ্রুত তা কার্যকর করার চেষ্টা করে চলেছে। এমনকি হাইকোর্টের রায়কে ন্যূনতম মর্যাদা না দিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র গ্রাহকদের দাম বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি বলেন, এইসব বিষয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী যদি দ্বিচারিতার পথ ত্যাগ করে জনস্বার্থে সমস্যার সমাধান না করেন, তাহলে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যে ৩০ শতাংশ দাম বাড়তে চলেছে তাকে যেকোন মূল্যে প্রতিরোধ করার অধিকার আপনাদের রয়েছে। তিনি বলেন, যে দিন এই দামবৃদ্ধির ঘোষণা হবে, সেদিনই আপনারা এস এস অফিসে নির্দেশের কপি পুড়িয়ে ঘেরাও বিক্ষোভ জানাবেন। পরের দিন বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অফিস ঘেরাও হবে। তারপর প্রতিরোধ আন্দোলনকে তীব্রতর করা হবে। তিনি উপস্থিত গ্রাহকদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, সময় নষ্ট না করে এখনই ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করুন, সর্বত্রই সমিতি গড়ে তুলুন। কারণ সময় আর আপনারা পাবেন না। মূল্যবৃদ্ধির এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ আপনাদের ওপর অবিলম্বেই নেমে আসতে চলেছে।

২২ জানুয়ারি কলকাতায় রাণী রাসমণি রোডে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির

কলকাতা জেলা

সম্মেলন

৮ই ফেব্রুয়ারি

ভারত সভা হল

সফল করুন

রাজ্য সরকারের নজিরবিহীন দ্বিচারিতা

একের পাতার পর

সরকারের পরিকল্পনাটা ছিল — মামলা চলতে চলতে পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে এবং আন্দোলনও হয়ে পড়বে স্তিমিত, তখন হাইকোর্ট যদি অভিন্ন মাশুলের পক্ষেও রায় দেয়, সরকারের অসুবিধা নেই। সরকারের এই হীন পরিকল্পনার কথা অ্যাবেকার পক্ষ থেকে সে সময়ই জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা যাতে ফলপ্রসূ না হয় এবং মামলা চলাকালীন কোনও অন্তর্ঘাত না হতে পারে, সেজন্যই 'অ্যাবেকা' ঐ মামলায় অংশ নেয়।

এই মামলায় সরকার পক্ষের প্রখ্যাত আইনজীবী শক্তিনাথ মুখোপাধ্যায়ও বলতে বাধ্য হন যে, আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণে কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া যায় না। কিন্তু ১৯৯৮ সালের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইনের ২৯(৩) ধারা অনুযায়ী গ্রাহকভিত্তিক মাশুল আলাদা আলাদা হতে পারে। অ্যাবেকার পক্ষ থেকে একই বক্তব্য উপস্থিত করে, গ্রাহক অনুযায়ী মাশুলের পার্থক্য বজায় রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে বলা হয়, কমিশন শুধু অভিন্ন মাশুল ঘোষণা করে ভুল করেছে তাই নয়, এমনকি ১১ নভেম্বর ০২, শুনানি না করে যে গড় মাশুল ঘোষণা করেছে, সেটাও আইন বিরুদ্ধ ও ভ্রান্ত। রাজ্য সরকার এবং সি ই এস সি উভয়েই কমিশনের গড় মাশুল ঘোষণাকে সমর্থন করেছে। একমাত্র অ্যাবেকাই এই বিরোধিতা করেছে।

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ১ আগস্ট '০৩ রায় দিয়ে বলে, যেহেতু অন্য কোর্টে গড় মাশুলের বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাই ডিভিশন বেঞ্চ ঐ বিষয়ে কোনও রায় দিচ্ছে না। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ১৬ ডিসেম্বরের ঘোষণাকে বাতিল বলে রায় দেয়, পুনরায় শুনানি করে মাশুল স্থির করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকারকেও সেই শুনানিতে অংশ নিতে বলে।

গত ৭ জানুয়ারি '০৪ ছিল কমিশনের সেই শুনানির শেষ দিন। ঐদিন অ্যাবেকার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আইনের ২৯(৩) ধারায় লোড ফ্যাক্টর, পাওয়ার ফ্যাক্টর, কী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে, ইত্যাদি যেসব বিষয় বিচার করার কথা বলা হয়েছে, তা করতে হলে সি ই এস সি'কে সঠিক বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। সেটা পেলেই দেখা যাবে যে, ক্ষুদ্র গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম কম হবে। সি ই এস সি যদি এ বিষয়ে সঠিক তথ্য না দেয়, তবে এই বিষয়গুলোকে মাশুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য করা চলে না। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'পারপাস অফ ইউজ', অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্যের পার্থক্যের ভিত্তিতেই মাশুলের পার্থক্য স্থির করতে হবে।

'বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য' যদি বিচারের প্রধান বিষয় হয়, তাহলে দেখা যাবে, ক্ষুদ্র গ্রাহক, বিশেষ করে ক্ষুদ্র গৃহস্থ গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম সব থেকে কম হবে। কারণ, এই শ্রেণীর গ্রাহকরা কেবলমাত্র ন্যূনতম সভ্য জীবনযাপনের জন্যই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ কাজে লাগিয়ে তারা মুনাফা করে না, এমনকি বিলাসবহুল জীবনযাপনও করে না। ডিভিশন বেঞ্চ তার রায়ে বলেছে — **"গৃহস্থ গ্রাহকরা নিজের জন্যই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, কোনও ব্যবসার জন্য নয়। তাই শিল্প গ্রাহকদের সাথে গৃহস্থদের সমান করে দেখা ঠিক হবে না। যদি উভয়ের কাছ থেকে একই মাশুল দাবি করা হয়, অথবা গড় মাশুলকে গৃহস্থের মাশুল হিসাবে দাবি করা হয়, তাহলে সেটা অন্যায্য হবে। সেই বিচার হবে ভ্রান্ত।"**

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ছিল রাজ্য সরকারের ভূমিকা। শুনানিতে অংশ নিয়ে বিদ্যুৎ সচিব বলেন, একথা ঠিক যে ২৯(৩) ধারাকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সি ই এস সি সরবরাহ করেনি। কারণ, এসব তথ্য সরবরাহ করার খরচ প্রচুর। তাই 'বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য' এই একটি বিষয়কে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে আমাদের উচিত হবে অন্যান্য রাজ্যের মতো পারস্পরিক ভরতুকি কমিয়ে আনা। তাই রাজ্য সরকার, ক্ষুদ্র বিদ্যুৎগ্রাহকদের (LT) দুই শতাংশ দাম বাড়িয়ে, বৃহৎ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের (HT) দুই শতাংশ দাম কমিয়ে দেবার মতামত দিচ্ছে। সরকারের ভোল পাল্টে গেল। অর্থাৎ, যে রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ মাশুলে পার্থক্য বজার রাখার জন্য হাইকোর্টে মামলা করল, এবং হাইকোর্টও মাশুল হারে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য নতুন করে মাশুল নির্ধারণ করতে কমিশনকে নির্দেশ দিল এবং ২৯(৩) ধারাকে পারস্পরিক ভরতুকি রাখার আইন বলে স্বীকার করল না, সেই রাজ্য সরকারই কমিশনের সামনে এসে সেই ২৯(৩) ধারাকে পারস্পরিক ভরতুকি হিসাবে দেখিয়ে বলল, তা কমিয়ে আনতে হবে, এবং সেটা করতে হবে গরিব, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাশুল বাড়িয়ে এবং বৃহৎ শিল্পের মাশুল কমিয়ে, যেটাই প্রকৃতপক্ষে কমিশনের ১৬ ডিসেম্বরের রায়ে বলা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের এই ভূমিকাকে জঘন্য দ্বিচারিতা ছাড়া কী বলা যাবে?

কমিশনের সুপারিশ বাতিল করার আইনি অধিকার সরকারের হাতে থাকা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার যখন সেটি প্রয়োগ না করে, আন্দোলনের চাপে, কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গিয়েছিল, তখনই এস ইউ সি আই ও অ্যাবেকার পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছিল, জনরোষের চাপে সরকারের এই পিছু হটা সাময়িক। সুযোগ পেলেই সরকার বৃহৎ শিল্পমালিক ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বার্থরক্ষায় সাধারণ গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাশুল আবার বাড়িয়ে দেবে। এই হুঁশিয়ারি আজ সত্য প্রমাণ হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই দ্বিচারিতার জন্য ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের বকেয়ার বোঝা গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপতে চলেছে। এবং এর প্রভাব পড়বে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে এবং ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ সালের মাশুল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের এই জনস্বার্থবিরোধী ভূমিকার ফলেই সাধারণ মানুষের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য বিদ্যুতের দাম কমানো হবে।

এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার জন্য অ্যাবেকা রাজ্যের ৫৬ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহককে আহ্বান জানিয়েছে।

গরিবের শিক্ষার স্বার্থে নয়

একের পাতার পর

শুধু নয়, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির পরে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই চিত্রটা কি দাঁড়ায়? সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ২৬/২৭ লাখ ছেলেমেয়ে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই চিত্র দাঁড়ায় ১৩/১৪ লাখে, অর্থাৎ এক বছরেই প্রায় অর্ধেক। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে এরা গর্ব করে থাকেন, বলেন — এখন সাড়ে চার লাখ/পাঁচ লাখ ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় বসছে, কী বিরাট উন্নতি ঘটিয়েছেন তাঁরা! কিন্তু একবারও বলেন না প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ২৬/২৭ লাখ ছেলেমেয়ের মধ্যে মাধ্যমিকে মাত্র ৪/৫ লাখ কেন? কেন সেই সংখ্যাটা ২০/২২ লাখ বা তার বেশি নয়?

প্রাথমিকে কেন আবার ইংরাজি ফিরিয়ে আনা হল, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনিলবাবুর সুরে সুর মিলিয়ে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেছেন — "বিগত ২৪ বছরে শিশুদের মানসিক পরিপক্কতা বেড়েছে, তাদের গ্রহণক্ষমতা বেড়েছে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, রাজ্যে সার্বজনীন শিক্ষা প্রায় শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০-১-০৪)।

গরিবের স্বার্থের কথা চিন্তা করলে তাঁরা স্কুল-কলেজে ব্যাপক হারে ফি বাড়াতেন না, মেডিকেলে ক্যাপিটেশন ফি চালু করতেন না, ব্যক্তিমালিকের মুনাফার স্বার্থে শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করতেন না

কান্তিবাবুর কথাগুলির যে কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই খোদ সাক্ষরতা প্রসার সমিতির চেয়ারম্যান সি পি এম নেতা বিমান বসুর কথাতেই তা প্রমাণিত হয়। বিমানবাবু বলেছেন — সারা রাজ্যে এখনও ২৬ শতাংশকে সাক্ষর করা যায় নি। এই সংখ্যা বাস্তবে আরো বেশি। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জন্মস্থান, খোদ বীরসিংহ গ্রামেই এখনও সকলকে সাক্ষর করা যায়নি। অথচ বিগত বছরগুলিতে কী রকম প্রচারের ঢেউ তুলে একের পর এক জেলাকে সাক্ষর ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা! মিথ্যা প্রচারে এঁরা সিদ্ধহস্ত।

রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হাল বর্তমানে কী দাঁড়িয়েছে? সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, স্কুলের সংখ্যা ৫১ হাজার, শিক্ষকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। ৫১ হাজার স্কুলের এই সংখ্যাটা বিগত ২০ বছর ধরে আজও একই অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ স্কুল বাড়ছে না। কিন্তু এটাও আসল চিত্র নয়, কারণ ইতিমধ্যে প্রায় ১৯০০ স্কুল উঠে গেছে। মূলত শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই সর্বনাশা অবস্থা। কলকাতা শহরে একের পর এক স্কুল উঠে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে শতাধিক স্কুল কলকাতায় উঠে গেছে, আরও ৮৩টা স্কুল তুলে দেওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা, যাতে বেশি বিরুদ্ধ প্রচার না হতে পারে।

ছাত্রসংখ্যার ক্ষেত্রেও চিত্র ভয়াবহ। খোদ কলকাতায় প্রায় ৮০ শতাংশ স্কুলে ছাত্র নেই বললেই চলে। টিমটিম করে স্কুলগুলি চলছে। অথচ দেশে জনসংখ্যা বাড়ছেই। তাহলে এই বিপুল জনসমষ্টি যাচ্ছে কোথায়? বেসরকারি স্কুলে, সেখানে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। লোকে কষ্ট করে পয়সা খরচ করে এ'সব স্কুলে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। কিন্তু অবৈতনিক সরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন না। কারণ তাঁরা কোন ভরসা পাচ্ছেন না। এখানে লেখাপড়া আদৌ হবে কিনা — এ বিষয়ে মানুষ সন্দিহান। পুরসভা পরিচালিত স্কুলগুলিরও একই হাল। একের পর এক স্কুল উঠে যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রী নেই বললেই চলে।

পৌনে দু'লক্ষ শিক্ষক বলা হলেও বাস্তবে ৪০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশেষ কোন বরাদ্দ নেই। পুরনো অব্যবহৃত কোটায় কিছু কিছু শিক্ষক মাঝে মধ্যে নিয়োগ হলেও কোনমতেই সমস্ত শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, এমনকি শহরাঞ্চলে যেখানে ছাত্রসংখ্যা রয়েছে — সে সব স্কুলও শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। বর্তমানে রাজ্যে মাত্র ১ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুল চলে প্রায় ৮ হাজার, ক্রমাগত এই সংখ্যা বাড়ছে, অচিরেই তা ১০ হাজারে পৌঁছাবে। আরও প্রায় ২০ হাজার স্কুল চলে মাত্র ২ জন শিক্ষক দিয়ে। এভাবে কি লেখাপড়া হয়? ন্যূনতম ৪টে ক্লাস (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুশ্রেণী ধরে ৫টা ক্লাস), কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা ১ বা ২ জন হলে — তাদের পক্ষে বাচ্চাদের পড়া ধরা, পড়া দেওয়া, লেখানো এবং তা ঠিকমত দেখা — কোনমতেই সম্ভব নয়। এর উপরে আছে সরকারি নির্দেশে বেহিসাবী কাজ — যেগুলো শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত নয়, অথচ শিক্ষকদের করতে বাধ্য করা হয়। (যথা ভোটের কাজ, জনগণনার কাজ, সার্ভে ইত্যাদি)। এছাড়া, স্কুলেও বর্তমানে সরকারি কল্যাণে শিক্ষকদের লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাকি কাজেই বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতে হয় (যেমন মূল্যায়নের খাতা প্রস্তুত করা, চাল বিতরণ, দফায় দফায় বিভিন্ন ট্রেনিং ও এ সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ)। ফলে লেখাপড়াটা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।

'৭৭ সালে ক্ষমতায় বসে এদের শিক্ষাক্ষেত্রে 'বিপ্লব ঘটানোর' সিদ্ধান্ত হল ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজি বাদ দেওয়া, ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে অবাধ প্রমোশনের ব্যবস্থা এবং বৃত্তি পরীক্ষা তুলে দেওয়া। এই সিদ্ধান্তগুলি জনজীবনে চাপিয়ে দেওয়ার সময় এদের যুক্তি ছিল, এর ফলে নাকি শিক্ষার প্রভূত উন্নতি ঘটবে। সাধারণ মানুষ ভীষণ-ভীষণ উপকৃত হবেন। কিন্তু দীর্ঘ ২৬ বছর বাদে আজ প্রতিটি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন — কতটুকু উন্নতি ঘটেছে ! যার আমলে এই নীতিগুলি জনজীবনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল — সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ২৬ বছর পরে অকপট স্বীকারোক্তি — ঐ সিদ্ধান্ত নাকি ভুল ছিল। একজন প্রবীণ রাজনীতিকের ভুল বুঝতে সময় লাগল ২৬ বছর? প্রাথমিকে ইংরাজি পড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য বছরের পর এ রাজ্যের মানুষকে আন্দোলন করতে হয়েছে। আন্দোলনের প্রথম ধাক্কায় তাঁরা স্থির করলেন ৫ম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানো হবে, তারপর দীর্ঘ বছর অনেক লড়াই, বাংলা বন্ধ-এর পর '৯৮ সালে তাঁরা স্থির করলেন ২য় শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানো হবে। আরও ৬ বছর পার করে এখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়াবেন।

অনিলবাবু বলেছেন, গরিবের স্বার্থেই তাঁরা নাকি প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি চালু করছেন। গরিব মানুষকে ছেলেমেয়েদের ইংরাজি পড়াতে যাতে আর ঘটিবাটি বিক্রি করে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করতে না হয় সেজন্যই তারা প্রাথমিকে ইংরাজি চালু করলেন। এইসব কথা বলে অনিলবাবু নিজেকেই হাস্যাস্পদ করে তুলছেন। এর দ্বারা তাঁরা যে এতদিন ধনিকশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে এসেছেন, একথা নিজেই স্বীকার করছেন। এই কথাই তো তাঁদের সম্পর্কে আমরা দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি। অথচ এটাকেই তাঁদের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর ষড়যন্ত্র বলে তাঁরা প্রচার করে আসছেন। আসলে এটাও তাদের মিথ্যাচার। না হলে মেডিক্যালে ক্যাপিটেশন ফি তারা চালু করতেন না, ছাত্রদের স্কুল-কলেজের ফি অস্বাভাবিক হারে বাড়াতেন না, ব্যক্তিমালিকের মুনাফার স্বার্থে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ করতেন না। একথা বুঝতে জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছেনা। ফলে প্রাথমিকে ইংরাজি চালু করাটা তাদের গরিবের স্বার্থেও নয়, শিক্ষার স্বার্থেও নয়। তাহলে কি কারণে দীর্ঘ বছর বাদে প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজি চালু করতে চলেছেন? কারণ একদিকে জনমতের প্রবল চাপ, অন্যদিকে আজ তাদের প্রয়োজন দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সেবাদাস একশ্রেণীর শিক্ষিত কেরাণীকুল। একসময় যাঁরা ইংরাজিকে 'সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা' আখ্যা দিয়ে বর্জন করার ডাক দিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই আবার প্রাথমিকে ইংরাজি ফিরিয়ে আনার কারণ হিসাবে বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রয়োজনের কথা বলছেন। ইংরাজি জানা একদল কর্মী সৃষ্টি করতে পারলে বিশ্বায়নের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দেশবিদেশের পুঁজিপতিরা সস্তায় দক্ষ শ্রমিক পেয়ে যাবে। ফলে তাদের শোষণের রাস্তা হবে মসৃণ। তুষ্ট পুঁজিপতিদের কৃপা লাভ করলে তবেই ক্ষমতার মসনদে চড়ে বসে থাকাটা সহজসাধ্য হবে এইসব মন্ত্রী-আমলাদের। ফলে, এখন প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি চালু করে তাঁরা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন। তাঁদের মূল স্বার্থ দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করছেন, আর জনগণকে বোঝাতে চাইছেন যেন শিক্ষার ন্যায্য দাবি সরকার মেনে নিল। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি ছাত্রস্বার্থের বিষয়টির এতটুকুও সম্পর্ক থাকত, তাহলে তাঁরা প্রাথমিকে পাশ-ফেল প্রথা এবং বৃত্তি পরীক্ষাও চালু করতেন; সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বসে পড়া পরিকাঠামো পুনর্গঠনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেননি।

কোচবিহার

বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবিতে ও মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে

যুব কনভেনশন

গত ১৭ জানুয়ারি কোচবিহার সদরে ডাঙ্গারহাট ডি ওয়াই ও ইউনিটের উদ্যোগে বন্ধ চা বাগান খোলা, মদের ঢালাও লাইসেন্সের সিদ্ধান্ত বাতিল ও বাসের বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে এক যুব কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন তিনশ'রও বেশি যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষ। হাট সংলগ্ন স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনের শুরুতে উপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সন্তোষ রায়, শ্যামল অধিকারী, বিমল দাস এবং গিরিধর রায়। মূল বক্তব্য পেশ করেন জেলা কমিটির সম্পাদিকা নাজমা খোন্দকার এবং সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য পিন্টু প্রতিহার। বক্তারা সকলেই একদিকে যেমন বন্ধ চা বাগানগুলি খোলা নিয়ে রাজ্য সরকারের মালিক তোষণকারী নীতির নিন্দা করেন, তেমনি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাটিকে ধীরে ধীরে মুমূর্ষু করে দিয়ে পরিবহন ব্যবস্থাটিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনার প্রতিবাদ জানান। কনভেনশন থেকে বর্ধিত বাসভাড়া প্রতিরোধে বাড়তি ভাড়া বয়কট, প্রয়োজনে লাগাতার অবরোধ সহ জঙ্গি আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ, সদস্য সংগ্রহ ও যুব কমিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় এস ইউ সি আই দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড রূপেশ্বর রায়।

বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথ অবরোধ

কোচবিহার জেলায় বেসরকারি বাসের অস্বাভাবিক ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৫ জানুয়ারি কোচবিহার সদরের সাত মাইল এলাকায় এস ইউ সি আই দলের আহ্বানে নিত্যবাসযাত্রী এবং এলাকার মানুষ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমরেড নৃপেন কার্যী। ঐদিন রাতে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে ঐ এলাকায় বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে ঘরবাড়ি আসবাবপত্র ভাঙচুর করে, নারী শিশু নির্বিশেষে সবাইকে মারধর করে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। বাসমালিকরা কয়েকজন আন্দোলনকারীর নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে থানায় ডায়েরি করে।

মালিকপক্ষের মিথ্যা অভিযোগে ডায়েরি করা, পুলিশি অত্যাচার ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে দলের পক্ষ থেকে ১৯ জানুয়ারি এলাকায় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন যাত্রী কমিটির আহ্বানে বাসযাত্রীরা বেসরকারি বাস বয়কট করে সরকারি বাসে যাতায়াত করে। ঐ দিন জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয় — পুরনো ভাড়া বজায় রাখতে হবে, পুলিশি অত্যাচার ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, দোষী পুলিশদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, বেসরকারি বাস কর্মীদের স্থায়ীকরণ ও সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

গত ১৭ জানুয়ারি দলের শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তরের চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করা হয় জেলার সমস্ত রুটে বাসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড নেপাল মিত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বন্দীমৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার দাবি করে, তাদের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে নাকি গণতন্ত্রের একটি আদর্শ মডেল তৈরি হয়েছে যা ভারতের তো বটেই, বিশ্বের মানুষকেও হতবাক ও চমৎকৃত করেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এতদিন যে অন্ধকারকে ঝকমকে প্রচারের আলো দিয়ে আড়ালে রাখা সম্ভব হয়েছে, অন্ধকার এতই গাঢ় ও বিস্তৃত হয়েছে যে তাকে আড়াল করা আর সম্ভব হচ্ছে না। গণতন্ত্রের একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে মানবাধিকার, অর্থাৎ মানুষের জন্য মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করা। এই অধিকার তো আমাদের দেশে কিছুই নেই, তবুও কোন অভিযোগে কোনও মানুষকে গ্রেপ্তার করে, আদালত বিচারের পরিবর্তে থানা লকআপে অথবা জেলহাজতে পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলবে — এই বর্বরতা অন্তত বন্ধ হোক — সভ্যদেশের মানুষের এটা ন্যূনতম ন্যায্য দাবি। বিচারাধীন বন্দীদের এই ন্যূনতম অধিকার কেন্দ্র ও সকল রাজ্য সরকারই মুখে মেনে নিয়েছে, এজন্য রাজ্যে রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে, যাদের দায়িত্ব এটা দেখা যাতে বিচারাধীন বন্দীদের 'হত্যা' করা না হয়। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড কেমন? সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে বন্দীমৃত্যুর খতিয়ান পাওয়া গিয়েছে।

সাল	পুলিশি হেফাজতে	জেল হাজতে	মোট মৃতের সংখ্যা
১৯৯৪-৯৫	১৪	১	১৫
১৯৯৫-৯৬	১৪	৩৭	৫১
১৯৯৬-৯৭	৬	৪২	৪৮
১৯৯৭-৯৮	১০	৪৩	৫৩
১৯৯৮-৯৯	৬	৪০	৪৬
১৯৯৯-২০০০	১৯	৪৩	৬২
২০০০-০১	৯	৩৮	৪৭
২০০১-০২	১৭	৫৪	৭১

বিহার ঃ ৮৬ শতাংশ বন্দীর নরকবাস

অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই বিহারের জেলগুলিতে 'নরকবাস' করছেন শতকরা ৮৬ জন বন্দী।

বিহারের মোট ৫৪টি জেলের প্রায় প্রতিটিতে নির্ধারিত সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি বন্দী রাখা হয়েছে। কয়েদিদের সংখ্যা কোন কোন জেলে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের থাকার জন্য জেলের উঠোনে প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে তাঁবু বানাতে হয়েছে। চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় গরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি করে থাকায় বহু বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি বিহারের কয়েকটি জেলে অপুষ্টিজনিত কারণেও কয়েকজন বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের মতে, বিহারের জেলগুলিতে বর্তমানে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে প্রায় ৭৩ শতাংশ বেশি বন্দী রয়েছে। কমিশনের হিসাবে, বিহারের জেলে থাকা ২১ হাজার ৭০৯ জন কয়েদির মধ্যে সাড়ে ১৮ হাজারেরও বেশি বিচারাধীন।

এই সমস্যা অবশ্য শুধুমাত্র বিহারেই নয়, অন্য কয়েকটি রাজ্যেও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এ এস আনন্দ জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, মেঘালয়ের মতো রাজ্যেও এই সমস্যা প্রকট। কমিশনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জেলে বর্তমানে ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৯২ জন বন্দীকে রাখার জায়গা রয়েছে। কিন্তু সেখানে আছেন ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৮১৩ জন।

(আনন্দবাজার, ২৪-১-০৪)

রাজারহাটে শিক্ষা কনভেনশন

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাজারহাটের প্রফুল্ল কানন দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দিরে গত ১৭ জানুয়ারি সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষক নেতা বিশ্বজিৎ পোদ্দার। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক তপন রায়চৌধুরী, ডঃ হরিসাধন কুণ্ডু, প্রদীপ বসাক ও প্রধান শিক্ষক প্রাণকৃষ্ণ ব্যানার্জী। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা সঞ্চালন করেন অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বানচাল করার ও শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলো যে পরিকল্পনা চালাচ্ছে, তাতে বক্তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। রাজারহাট থানা জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও ডঃ হরিনারায়ণ কুণ্ডুকে সম্পাদক করে একটি কমিটি এদিন গঠন করা হয়।

কর চাপানোর বিরুদ্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ লোকাল কমিটির অধীন কাপাসডাঙ্গা পঞ্চায়েত প্রধানের নিকট ১৬ জানুয়ারি বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গরু, ছাগল, মুরগি, গাধা, সাইকেল প্রভৃতির উপর পঞ্চায়েত ট্যাক্স বসানোর প্রতিবাদে, নতুন হারে খাজনা বৃদ্ধি, পঞ্চায়েত এলাকায় মদের দোকান খোলার প্রতিরোধে, সমস্ত গরিবদের বিপিএল তালিকায় নাম ও রেশন কার্ড দেওয়া, ফসলের ন্যায্য মূল্য ও গ্রামীণ মজুরদের সারা বছর কাজ সহ নয় দফা দাবিতে এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ আই কে কে এম এস-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আব্দুল জব্বার সরকার এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কমরেডস্ সাইদুল ইসলাম, জিতেন চন্দ্র দাস প্রমুখ। তাঁরা এই স্বৈরাচারী কর নীতির বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ত্রিপুরায় মহিলা কনভেনশন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে পণপ্রথা, নারী নির্যাতন, নারী পাচার, নারী ধর্ষণ, বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রদর্শন, অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি প্রচার ও নারী সমাজের উপর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ১০ জানুয়ারি ত্রিপুরার আগরতলা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি হলে এক মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড শিবানী দাস এবং সভা পরিচালনা করেন কমরেড শুক্লা চক্রবর্তী। কনভেনশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা অঞ্জলি চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি কমরেড অরুণ ভৌমিক। সভার সূচনায় বক্তব্য রাখেন কমরেড শেফালী ভৌমিক। বক্তারা বলেন, আজকের পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের যুগে নারীমুক্তি আন্দোলন সমাজমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই নারীমুক্তি আন্দোলনকে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবেই গড়ে তুলতে হবে।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড অরুণ ভৌমিক

দুই খনি শ্রমিকের মৃত্যু নিরাপত্তার দাবিতে ম্যানেজার ঘেরাও

গত ৪ জানুয়ারি বেলা ১২টার সময় পুরুলিয়া জেলার দুব্যেশ্বরী খনির ছাদ ধ্বসে পড়ায় দুজন কর্মরত শ্রমিক দিলীপ বাউরী ও ভগবান রাম মারা যান। ভগবান রাম খনি অভ্যন্তরেই সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। দিলীপ বাউরীকে নিকটস্থ শাকতোড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসক এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁকে ধানবাদে স্থানান্তরিত করার সময় মাঝপথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন দিলীপ বাউরী।

খনির ছাদ ধ্বসে মৃত্যু দুব্যেশ্বরী খনিতে এই প্রথম নয়। ১৯৮৮ সালে এইভাবেই মৃত্যু হয়েছিল চারজন শ্রমিকের। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অভাবে ইতিমধ্যেই এই কোলিয়ারিতে মোট নয় জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত কোল মাইনার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ খনি কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানান। সেই সময় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মালিক পক্ষ নিরাপত্তার পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পর্যন্তই। বাস্তবে শ্রমিক-দের নিরাপত্তার জন্য মালিকপক্ষ কিছুই করেনি। শ্রমিকদের খাটিয়ে শুধু মুনাফা করাই মালিকদের উদ্দেশ্য। আর সেইজন্যই কোলিয়ারিতে দুর্ঘটনায় এভাবেই শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটছে।

মালিকদের নিষ্ঠুর অবহেলায় দুই শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শিফ্‌টের কর্মরত কোল মাইনার্স ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিমাই মাইতি, গোপাল ওঝা, বিজয় বাউরী অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ শ্রমিকরা মৃতদেহ খনির ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখান। কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে আসেন কোল মাইনার্স ইউনিয়নের প্রবীণ নেতা এস এস ঠাকুর, নবনী চক্রবর্তী। খনির এজেন্ট ও ম্যানেজারকে ঘেরাও করে নিহত দুই শ্রমিক পরিবারের লোকেদের চাকরি প্রদান, ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করে দোষী অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। এই দাবিতে শ্রমিকরা কর্মবিরতিও পালন করেন। পরে কর্তৃপক্ষ পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস সহ দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে কর্মবিরতি তুলে নেওয়া হয়।

মার্কিন রকেটের বিরুদ্ধে একদিন পাথরযন্ত্রেরই জয় হবে

হিদার কোটিন জারভেসি

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'দানবের গর্ভে বসে আমরাও প্রতিরোধে সামিল' লেখাটির শেষাংশ)

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হল — একটি প্যালেস্তাইন তরুণের হাতে ধরা একখণ্ড পাথর। মার্কিন রকেটের বিরুদ্ধে একদিন এই পাথরের টুকরোরই জয় হবে। ১৯৪৭ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রসংঘ ইজরায়েলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইহুদিবাদী উপনিবেশ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। প্যালেস্টিনীয়দের হত্যা করা হয়েছে, নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, কিংবা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছে। ইজরায়েলের দুটি যুদ্ধ এবং নিজ সীমান্ত বাড়াবার জন্য লেবাননে ইজরায়েলের আগ্রাসনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানিয়েছে।

ইজরায়েলের জন্ম দিয়েছে জাতিবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদ। জেনারেল মোশে দায়ান একবার বলেছিলেন — "ইজরায়েলকে হতে হবে পাগলা কুকুরের মতো, যার কথা ভাবলেই শিউরে উঠতে হবে।"

ইজরায়েল রাষ্ট্রটির কাজ হল আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে তোলা। ইজরায়েলের জাতিবিদ্বেষী নীতি, তৈরি করা ঘৃণ্য বেড়া, জাতিগত গণহত্যা — এসব কিছুর মধ্য দিয়ে বিশ্বে ইজরায়েল সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি করা হয়েছে যেন এটি একটি অবাধ্য রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে তা আদৌ নয়; ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরোপুরি বাধ্য রাষ্ট্র। আমেরিকা থেকে এই রাষ্ট্রটি সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পায়। দখলদারি ও গণহত্যার বিভীষিকার নিদর্শন দেখাতেই আমেরিকা ইজরায়েলকে টাকা দেয়।

প্যালেস্টিনীয় প্রতিরোধের যারা শিকার হয়েছে সেই ইজরায়েলি মানুষদের দেখিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম বিশ্ববাসীর সহানুভূতি আদায়ের জন্য প্রচার চালালেও সারা বিশ্বের মানুষ প্যালেস্টিনীয় সংগ্রামের সাহসিকতায় মুগ্ধ।

বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের নিদর্শন হচ্ছে প্যালেস্টিনীয় ইন্তিফাদা (গণবিদ্রোহ) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের চোখে এ হল অনমনীয় শত্রু। আজকের ইন্তিফাদা ইজরায়েল রাষ্ট্রের মৃত্যুঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছে।

জেরুজালেমের হিব্রু ইউনিভার্সিটির সামরিক ইতিহাসের অধ্যাপক মার্টিন ভ্যান ক্রেভেল্ড বলেছেন — "ইন্তিফাদা যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে ইজরায়েল সরকার জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে। আমার মনে হয় ইজরায়েলের পরাজয় এড়ানো যাবে না... আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলব।"

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে আরবদের সমালোচনাকে বিপথগামী করার জন্য আমেরিকা ইজরায়েলকে ব্যবহার করছে। আরব জনগণের প্রধান শত্রু হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে ইজরায়েলকে, যার দ্বারা আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে আরব দেশগুলির দালাল বুর্জোয়া সরকারগুলিকে, যাদের আমেরিকা রীতিমতো টাকা দিয়ে পোষে। পুঁজিবাদী শোষণে লক্ষ লক্ষ আরব জনগণ ধুঁকছে। আই এম এফ, ডব্লিউ টি ও, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্বসম্পদের মালিক বহুজাতিকদের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সরকারের মারফতে তারা এই কাজই চালায়।

ইহুদিরাষ্ট্রবাদের (জিয়নিজম) প্রতি বিরোধিতাকে সেমিটিক জাতির প্রতি বিরোধিতার সাথে যুক্ত করে খুব চালাকির সঙ্গে ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের দিক থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ইহুদি রাষ্ট্রবাদ হল ১৯ শতকের সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ, ধর্মের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে ইহুদিদের অধিকাংশই ছিল পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ, ইহুদিবাদকে তারা স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু হিটলার ইউরোপে এই কমরেডদের, শ্রমিক আন্দোলনের কমিউনিস্ট নেতাদের হত্যা করেছিল। এরপর ইহুদিদের মধ্যে যে বুর্জোয়া অংশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুর মিলিয়ে ইজরায়েলকে একটি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাজির করে।

ইজরায়েলে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টিনীয়দের তাদের ঘর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ৩৫ হাজার আরব নিহত হয়েছিল, আর মাত্র ৬০০ ইজরায়েলি মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০'র দশকে ইজরায়েলের বড় ধরনের পরাজয় ঘটেছিল লেবাননে, এখন আবার একটা বড় পরাজয়ের তারা সম্মুখীন হচ্ছে।

মার্কিন কর্পোরেট প্রচার মাধ্যম গত ৩৬ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলি হানাদারদেরই অবিচারের শিকার হিসাবে দেখিয়ে আসছে। অন্যদিকে প্যালেস্তাইন জনগণ অনতিক্রম্য বাধার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছে — যে লড়াইকে কখনও ধ্বংস করা যায়নি। তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে। একই সঙ্গে ইজরায়েলি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রটিকে অভিহিত করা হচ্ছে 'মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতন্ত্র' হিসাবে। এইভাবেই গোয়েবলসীয় পদ্ধতিতে মিথ্যা সাজিয়ে এই ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের যোগসাজসকে আড়াল করতে চাইছে। প্যালেস্টিনীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ইজরায়েলি লিখেছেন ঃ "ইজরায়েল অবিচারের শিকার এই ধারণা সেমিটিকদের প্রতি বিরোধিতাকে খোরাক যোগায়। ...ইজরায়েলের ক্ষেত্রে আপনি আন্তর্জাতিক আইন-কানুন প্রয়োগ করতে পারবেন না। আপনি মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাও আরোপ করতে পারবেন না, ইজরায়েলের কার্যকলাপের জন্য তাকে দায়ী করতেও পারবেন না। কারণ আমরা হলাম...পরিস্থিতির বলি, আমরা যা কিছু করছি তা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই। আপনি আমাদের সমালোচনা করতে পারবেন না — করলেই বলা হবে, আমরা ইহুদি; আপনারা আমাদের নির্যাতন করেছেন।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যেকোন রকমের সমালোচনাকেই অভিহিত করা হয় — সেমিটিক জাতির প্রতি বিরোধিতা বলে। যদিবা কখনও কোন সমালোচনা মাথা তুলতে পারে, সেই সমালোচনায় এই অঞ্চলে মার্কিন নীতির নিন্দা থাকে না।

ইহুদিবাদীরা যদি 'পাগলা কুকুর'ই হয়, তাহলে বলতে হয় যে তাদের গলার শেকল রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষ করে মার্কিন সুপার পাওয়ার-এর হাতে।

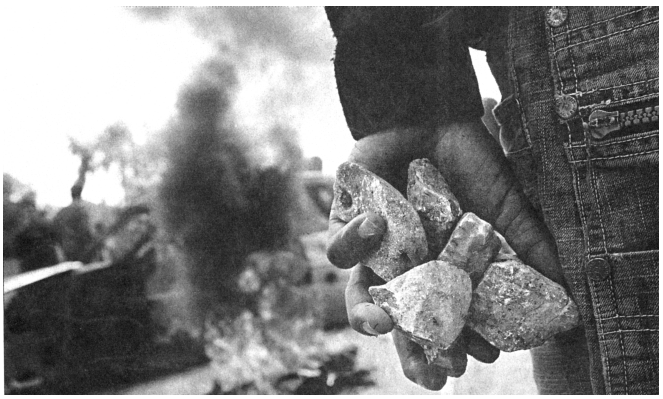

বুদরুসে প্যালেস্তাইন শিবিরে ইজরায়েলি হানাদারির বিরুদ্ধে পাথর হাতে প্যালেস্তাইন তরুণ। (ছবি ঃ হিন্দুস্তান টাইমস্, ২-১-০৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজোড়া অস্ত্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ইজরায়েলিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা যে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্র ও তার নকসা তৈরি করে, বা আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র কেনে তাই নয়, মার্কিন অস্ত্রসম্ভার বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রধান 'সাবকন্ট্রাক্টার'-এর ভূমিকাও পালন করে ইজরায়েল। সম্প্রতি চীন এবং ভারতবর্ষে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি করার জন্য এই দুই দেশের সৈন্যদের মার্কিন অস্ত্রব্যবহারের ট্রেনিং দেবার জন্য ইজরায়েল কয়েক শো কোটি ডলারের চুক্তি করেছে।

বর্তমানে চলা ইন্তিফাদা (গণবিদ্রোহ) শুরু হবার পর জেনিন অথবা রামাল্লায় ইজরায়েলিরা যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, যেভাবে তারা জলপাই বাগিচা, স্কুল, হাসপাতাল কিংবা ঘরবাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছে, যেভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তারা প্যালেস্টিনীয় শিশুদের খুন করেছে, তাকে জাতিবিদ্বেষ, গোটা জাতিকে নির্মূল করার অভিযান তথা গণহত্যা ছাড়া অন্য কী বলা যায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ইজরায়েলের এই কার্যকলাপ আর কেউ সমর্থন করেনি। ধীরে ধীরে ইন্তিফাদার প্রতি সমর্থন গড়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি আজ জোর গলায় স্লোগান দিচ্ছে — "প্যালেস্টাইনকে মুক্ত কর!" ANSWER জোটের মার্কিনী প্যালেস্টিনীয় নেতা ইলিয়াস রাস মাউয়ি বলেছেন — 'যুদ্ধবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নোঙর রয়েছে প্যালেস্টাইনে।'

ইন্তিফাদা ইরাকি প্রতিরোধকে অনুপ্রাণিত করেছে। যদি পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে তরুণরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, তাহলে রাইফেল এবং রকেট লঞ্চার নিয়ে সাধারণ মানুষ বিশ্বের এক নম্বর শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না কেন? বলিভিয়ার প্রায় দশ লক্ষ অধিবাসী, তাদের দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস চুরি হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে অক্টোবর মাসে পথে নেমেছিল — এরাও প্যালেস্টিনীয়দের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যকে উপনিবেশ বানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্ট্র্যাটফর বলেছেন, 'ইরাক আক্রমণ করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাঘের পিঠে চড়ে বসেছিল.... এখন সেখান থেকে নিচে নামার কোন সহজ উপায় নেই।"

ইজরায়েলের ইহুদিবাদী সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কথা দিয়েছে ইরাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, মধ্যপ্রাচ্যে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে দেবে এবং গোটা ইউরেশিয়া জিতে নিয়ে লুঠপাট চালাবে। এই কাজে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ন্যাটো, বিশ্বায়ন, বিশ্বব্যাঙ্ক কিংবা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারকে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু হানাদারি পরাস্ত হতে বাধ্য। কারণ, বাঘের পিঠে চড়ে থাকা যায় না, পিঠ ঝাঁকিয়ে ফেলে দিয়ে বাঘ তাদের খেয়ে নেয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের থাবা প্রসারিত হচ্ছে, তারই সঙ্গে বেড়ে উঠছে মার্কিন সমরবাদ। কিন্তু তা করতে গিয়ে — লেনিন যাকে বলেছিলেন — "পররাজ্য দখলকারী, লুণ্ঠনকারী এবং দস্যুতামূলক যুদ্ধ" — সেই যুদ্ধের বিপক্ষে কোটি কোটি প্রতিবাদী মানুষকে তারা পথে টেনে নামাচ্ছে। সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষ, বেকারত্বের চাপে পড়ে যে সব মানুষ সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে, ভেনেজুয়েলার শ্রমিকরা, বলিভিয়ার মানুষরা, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, ইরাক থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষ — কেউই এই অত্যাচার কিংবা এই উপনিবেশবাদের কাছে মাথা নত করবে না! পুঁজিপতিদের হেড কোয়ার্টার সহ পৃথিবীর সর্বত্র ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে। এই যুদ্ধগুলির খরচ জোগাতে জনগণের অর্থ চুরি করা হয়েছে, বুর্জোয়া সরকারগুলি সমাজকল্যাণ কর্মসূচি ছাঁটাই করছে। ইটালি, বেলজিয়াম এবং জার্মানির শ্রমিকরা এই অর্থ ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন চালাচ্ছে, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ধর্মঘটের ডাক। ভীত সাম্রাজ্যবাদীদের ঝুলিতে পড়ে আছে কেবল ভয় দেখানোর কৌশল ও মিথ্যা। তাদের এমন সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে যারা যুদ্ধ করতে রাজি নয়। এমন মিত্র সরকারগুলির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যারা নিজের দেশের জনগণকে ভয় পায়। এই পরিস্থিতিতে "আঘাত ও ভয় দেখানোর" নীতি কাজ করবে না। পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি কাজ দেবে না। এ'কথা আজ স্পষ্ট যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে মানবজাতির শত্রু। প্রতিটি দেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। সমাজতন্ত্রই এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ এবং প্রতিটি দেশের বামপন্থীদের অগ্রণী অংশ একথা জানে। তাই 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতে আমরা গলা মিলিয়ে বলি — "শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেডস্/এসো মোরা মিলি একসাথ।"

(সমাপ্ত)

ইরাক ডায়েরি

মাকে লেখা চিঠিতে মার্কিন সেনার গভীর হতাশা

মার্কিন সেনাবাহিনীর ৮২তম এয়ার বোর্ন ডিভিশনের এক সেনা তার মায়ের উদ্দেশে চিঠিতে লিখেছে, ''গেরিলা আক্রমণের যে সব খবর কাগজে ছাপে তার চাইতে অনেক বেশি অ্যাকশনের সামনে প্রতিদিন আমাদের পড়তে হচ্ছে। সে সঙ্গে চলছে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল। জনাকয়েক মার্কিন অনুরাগী ছাড়া আজকের ইরাকে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা মার্কিনী কাজকর্মের সমর্থক। খুব উদ্বেগের মধ্যে আমাদের দিন কাটছে।'' (এ পি, ডেকান হেরাল্ড ১২-১-০৪)

গেরিলা যোদ্ধারা গুঁড়িয়ে দিল হোটেলের একাংশ

৯ জানুয়ারি মধ্য বাগদাদের বুর্জ-আল-হায়াত হোটেলে গেরিলারা রকেট ছোঁড়ায় হোটেলের দোতলা ও তিনতলা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চতুর্থ তলে ছিলেন একদল বিদেশি সাংবাদিক। তাঁদের কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হন। (টেলিগ্রাফ ১০-১-০৪)

বিমানে রকেট হানা

মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি সি-৫ পরিবহন বিমান লক্ষ্য করে গেরিলারা রকেট ছোঁড়ে। বিমানে যাত্রী ছিল ৬৩ জন, বেশির ভাগ যাত্রীই সেনাকর্মী। আহত যাত্রীদের নিয়ে বিমানটি বিমান বন্দরে ফিরে আসে।

ভোরের দিকে বাগদাদের রাস্তায় একটি দেশি বোমা ফেটে টহলরত দুজন মার্কিন সেনা নিহত হয়। (এ পি, হিন্দু ১০-১-০৪)

ড্যানিশ ও ব্রিটিশ সেনা নিহত

১০ জানুয়ারি গেরিলাদের ছোঁড়া গ্রেনেডের আঘাতে দখলদার বাহিনীর শরিক এস্টোনীয় বাহিনীর দু'জন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

একই দিনে ফালুজা শহরে দু'জন ড্যানিশ টহলদারী সেনা নিহত হয়েছে।

বাগদাদ থেকে ৩২০ কিমি দক্ষিণপূর্বে শিয়া অধ্যুষিত শহর আমরাহাতে চাকরির দাবিতে প্রায় ৬০০ জন ইরাকি মিছিল করে। অতপর উক্ত এলাকায় মোতায়েন ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে মিছিলকারীদের সংঘর্ষ বাধে। সেনাবাহিনীর উপর ইটপাটকেল বোমা পড়তে থাকে।

(রয়টার্স, হিন্দু ১১-১-০৪)

দখলদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ — খাদ্য ও চাকরির দাবি

১১ জানুয়ারি আমরাহা শহরে ব্রিটিশ সেনাদের কালো পতাকা দেখানো হয়।

উত্তরের তৈল নগরী কিরকুকে মার্কিন সেনাঘাঁটির সামনের রাস্তায় দু'টি মর্টারের শেল বিস্ফোরণে কয়েকজন মার্কিন সেনা আহত হয়। (এ পি, হিন্দু, ১২-১-০৪)

এছাড়া বাগদাদের ১৭৫ কিমি দক্ষিণ পূর্বে অপর এক শিয়া অধ্যুষিত শহর আল-কুট এ প্রায় এক হাজার মানুষ খাদ্য ও চাকরির দাবিতে মিছিল করে। (রয়টার্স, ডেকান হেরাল্ড, ১২-১-০৪)

মিছিলকারীরা ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দিল

১২ জানুয়ারি মধ্য বাগদাদে মার্কিন সেনা কনভয়ের ওপর বোমা ছোঁড়া হলে একজন মার্কিন সেনা নিহত এবং দু'জন আহত হয়।

আলকুট শহরে নাগরিকদের মিছিলে ইউক্রেনীয় ট্যাঙ্ক আক্রমণ করতে এলে মিছিলকারীরা পাল্টা বোমা ছোঁড়ে। এতে ট্যাঙ্কটি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। (এ পি, হিন্দু, রয়টার্স, ১৩-১-০৪)

তিনটি হেলিকপ্টার গুলি করে নামালো গেরিলারা

১৩ জানুয়ারি বাগদাদের ৮০ কিমি পশ্চিমে হাব্বানিয়া শহরে একটি মার্কিন এ-এইচ-৬৪ অ্যাপাচে হেলিকপ্টারকে গেরিলারা গুলি করে নামিয়েছে — এ নিয়ে বিগত দু-সপ্তাহের মধ্যে গেরিলারা তিনটি হেলিকপ্টার গুলি করে নামালো।

মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ শুধু সুন্নিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে নয়, শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেও ব্যাপক আকার নিয়েছে। (এ পি, হিন্দু, ১৪-১-০৪)

বুশ তুমি কাপুরুষ — মিছিলে শ্লোগান

ফালুজা শহরে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভে সেনারা গুলি চালায়। এক বয়স্কা মহিলা সহ চারজন ইরাকি নাগরিক নিহত হয়। এরপরই মার্কিন টহলদার বাহিনীর ওপর রকেট ছোঁড়া হয়। ফলে দুজন মার্কিন সেনা নিহত হয়। ''বুশ, তুমি কাপুরুষ'' শ্লোগান সহযোগে প্রায় ৫০০ ইরাকি মিছিল করে।

অন্যদিকে সাদ্দাম অনুগতদের ধরার জন্য মার্কিন সেনারা ফালুজা শহরের বাড়ি বাড়ি তল্লাসি চালাবার সময় একজন যুবতীকে ধরে নিয়ে আসে। সেই যুবতীর মুক্তির দাবিতে ফালুজা শহর আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ অতঃপর ঐ যুবতীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

(রয়টার্স, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ১৪-১-০৪)

দালালরা হুঁশিয়ার

১৪ জানুয়ারি মধ্য ইরাকের সুন্নি অধ্যুষিত বাকুবা শহরের একটি থানার সামনে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ১৪ জন ইরাকি পুলিশ আহত এবং দুজন নিহত হয়। দখলদার মার্কিন সেনাদের সহযোগিতা করার অপরাধে ইরাকি পুলিশবাহিনীকে উপযুক্ত পুরস্কারই দিচ্ছে।

(ডেকান হেরাল্ড, রয়টার ১৫-১-০৪)

অন্তবর্তী সরকার নয় — নির্বাচনের দাবি

১৫ জানুয়ারি নির্বাচনের দাবিতে ১০ হাজারের বেশি শিয়া ধর্মাবলম্বী মানুষ বসরা শহরে মিছিল করেছে। দখলদার মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের অনুগতদের মনোনীত করে ইরাকে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের চক্রান্ত চালাচ্ছে তার তীব্র বিরোধিতা করেছে মিছিলকারীরা। অনতিবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে মিছিল থেকে। (রয়টার্স, টেলিগ্রাফ ১৬-১-০৪)

মার্কিন প্রশাসনিক সদর দপ্তরে গাড়িবোমা — গোয়েন্দা রিপোর্ট মিথ্যা প্রমাণিত

দিন কয়েক আগে একটি মার্কিন সেনা গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সাদ্দাম হোসেন ধরা পড়ার পর থেকে ইরাকে প্রতিরোধ লড়াই ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গোয়েন্দাদের আশা, আগামী মাস দুয়েকের মধ্যে প্রতিরোধ লড়াইয়ের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যতে এসে ঠেকবে। এই রিপোর্ট

১৭ জানুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস প্রমুখ মার্কিন সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনাম সহযোগে ছাপা হয়। পরদিনই ১৮ জানুয়ারি গেরিলারা ইরাকে দখলদার মার্কিন সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক সদর দপ্তরে আত্মঘাতী গাড়িবোমা ফাটিয়ে ২৫ জনকে নিহত ও ৬০ জনের বেশি মানুষকে আহত করেছে। (এ এফ পি, ডেকান হেরাল্ড, ১৯-১-০৪)

১৬ জানুয়ারি বাগদাদের ১৯ মাইল উত্তরে সাদ্দাম জমানার সামরিক শিল্পাঞ্চল তাহি শহরে বোমা বিস্ফোরণে একটি চলমান ভারী সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন ধরে গেলে তিনজন মার্কিন সেনা নিহত ও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছে। (রয়টার্স, সানডে টাইমস, ১৮-১-০৪)

১৭ জানুয়ারি তিকরিত শহরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে তিনজন মার্কিন সেনা নিহত এবং ইরাকি বেসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের দুজন অফিসারও নিহত হয়েছে। এছাড়া দুজন মার্কিন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (ঐ)

১৮ জানুয়ারি বাগদাদ শহরে দখলদার মার্কিন সেনাদের সদর দপ্তর এবং প্রশাসনিক সদর দপ্তরের প্রধান ফটকের সামনে বিস্ফোরক ভর্তি একটি সাদা টয়োটা গাড়ি বিস্ফোরণে ২৫ জন নিহত ও ৯৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। অনেকের অনুমান সেখানে দেড়শ থেকে দুশোজন মার্কিন সেনা ছিল। (এ এফ পি, হিন্দু, ১৯-১-০৪)

১৯ জানুয়ারি বসরা শহরে তেলবাহী পাইপ লাইনের একাংশ গেরিলারা গ্রেনেডের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে। গেরিলাদের আক্রমণে পাইপ লাইনে পাহারারত তিনজন বুলগেরীয় সেনা মারা যায়। (ডেকান হেরাল্ড, রয়টার্স, ২০-১-০৪)

২০ জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় বাগদাদের ৬৫ কিমি উত্তরে বাকুবা শহরে একটি মার্কিন ঘাঁটির উপরে গেরিলারা মর্টার ও রকেট নিয়ে আক্রমণ চালালে মার্কিন বাহিনীর তিনজন সেনা নিহত হয়েছে।

২২ জানুয়ারি ফালুজা থেকে রামাজি শহরে যাওয়ার পথে হাইওয়ের ওপর একটি পুলিশ চৌকিতে গেরিলারা আক্রমণ চালালে দুজন ইরাকি পুলিশ মারা যায়। এ ঘটনার ঘণ্টা দুয়েক পরে গেরিলারা একটি মার্কিন ঘাঁটির উপর মর্টার আক্রমণ চালালে তিনজন মার্কিন সেনা নিহত হয়।

একটি বাস গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সে বাসের আরোহী চারজন ইরাকি মহিলা শ্রমিক নিহত ও অপর ছজন মহিলা শ্রমিক গুরুতভাবে আহত হয়েছেন।

বাগদাদের দক্ষিণে দিওয়ানিয়া (Diwanya) অঞ্চলে ইরাকি ও স্পেনীয় পুলিশের একটি সম্মিলিত দল গেরিলাদের বিরুদ্ধে যৌথ অপারেশন চালানোর সময় গেরিলাদের গ্রেনেড আক্রমণে স্পেনীয় পুলিশের একজন কমাণ্ডার মারা যায় এবং অপর ছ'জন গুরুতর আহত হয়।

(রয়টার্স, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৩-১-০৪)

লাতিন আমেরিকা জুড়ে গণবিক্ষোভ

শিক্ষার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে হণ্ডুরাসে শিক্ষক ধর্মঘট

সাম্রাজ্যবাদী অর্থভাণ্ডার আই এম এফ-এর নির্দেশ মেনে হণ্ডুরাস সরকার শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে। সরকারের এই চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য সে দেশের শিক্ষক সমাজ ২৫ নভেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটের সমর্থনে ২০ নভেম্বর সে দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর তেগুচিলিয়াপাতে এক মিছিল বার করে, সেই মিছিলে ৭০ হাজার শিক্ষক যোগ দেন।

(ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ১-১-০৪)

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষক আন্দোলন ইকুয়েডরে

বেতনবৃদ্ধির দাবি জানিয়ে ১৪ ডিসেম্বর ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটো শহরে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক মিছিল করে। শিক্ষকদের দাবির প্রতি সমর্থন এবং শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে সে দেশের ছাত্ররা পরের দিন ১৫ ডিসেম্বর দেশে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। (ফ্রন্টলাইন, ২-১-০৪)

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সান্টো ডোমিন গো শহরে প্রতিবাদ মিছিল

খ্রীস্টমাস-র দুদিন আগে ২৩ ডিসেম্বর প্রায় ১৫ হাজার মানুষ মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী শ্লোগান তুলে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সান্টো ডোমিন-গো শহরে মিছিল করেছে। মিছিলে ১০০টি গাধা ও কয়েক ডজন বাইসাইকেল দেখা গেছে। মিছিলের অন্যতম উদ্যোক্তা ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস-এর নেতা র‍্যামন পেরেজ ফিগুয়েরিও (Ramon Perez Figuereo) দৈনিক 'এল ন্যাচিনাল'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ''যে হারে পরিবহনের ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে গরিব জনসাধারণকে বাধ্য হয়ে বাহন হিসাবে গাধা ও বাইসাইকেল ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবাদে আমরা গাধা ও বাইসাইকেল নিয়ে মিছিল করেছি।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মিছিলের দিনদুয়েক আগে প্রেসিডেন্ট হিপোলিটো মেঝিয়া (Hipolito Mejia)-র সরকার এক ফরমান জারি করে বিদ্যুৎ, পাঁউরুটি, রান্নার গ্যাসের দাম এবং পরিবহনের ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। সে দেশটিতে এখন মুদ্রাস্ফীতির হার হল ৭৫ শতাংশ। মেজিয়া সরকার আই এম এফ-র নির্দেশে দেশে দেশে নতুন করে ব্যয়সঙ্কোচনের নীতি ঘোষণা করেছে, এর ফলে বিভিন্ন পরিষেবা থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে সঙ্কটে পড়েছে দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষরা।

২২ ডিসেম্বরের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি-বিরোধী মিছিল আটকাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ৫ জন আহত হয় এবং ৪০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

(ওয়ার্কাস ওয়ার্ল্ড, ১-১-০৪)

প্রচণ্ড মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভে মেকসিকো উত্তাল

প্রস্তাবিত আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (ফ্রি ট্রেড এরিয়া অফ আমেরিকা – FTAA) চুক্তি থেকে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েডার, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রমুখ দেশগুলি সরে দাঁড়ালে এ চুক্তি আদৌ কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ সংশয় কাটিয়ে ওঠার জন্য লাতিন আমেরিকার সব দেশগুলিকে নিয়ে মেক্সিকোর মনতেরে শহরে

আটের পাতায় দেখুন

ওদের নৈতিক অধিকার নেই নেতাজিকে মাল্যদান করার

একের পাতার পর

রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নেতাজির প্রতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরোধিতা ও কংগ্রেস থেকে তাঁর বহিষ্কার এবং অবিভক্ত সিপিআইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস তুলে ধরেন। গত শতাব্দীর তিনের দশকে হরিপুরা, ত্রিপুরী এবং রামগড় অধিবেশনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে পদে পদে নেতাজির বিরুদ্ধতা করেছে। তাঁকে অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। তিনি বলেন, সেই কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী নীতিরই ধারকবাহক তৃণমূলেরও নেতাজির ছবিতে মাল্যদানের কোন নৈতিক অধিকার নেই। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিভক্ত সিপিআইয়ের বেইমানির বিশদ তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণও তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আর এস এস এবং হিন্দুত্ববাদীরা তো ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে স্বাধীনতার লড়াই মনেই করে না। তারা সর্বদাই স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে থেকেছে। এদের বিরুদ্ধে নেতাজি নিজে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এই বলে যে — যারা গেরুয়া ত্রিশূল দেখিয়ে ভোট ভিক্ষা করে তাদের সম্পর্কে জনগণ যেন সজাগ থাকেন।

প্রভাস ঘোষ বলেন, একটা মার্কসবাদী পার্টি হিসাবে আমাদের দল এস ইউ সি আই নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের একজন মহান জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা হিসাবে গণ্য করে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। অসাধারণ স্বার্থত্যাগে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, কঠিন সংগ্রামে, অনন্যসাধারণ সাহস এবং তেজস্বিতায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে — একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো তিনি আছেন এবং থাকবেন। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে আমরা দেখি। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ — সেযুগের বিপ্লবী নেতাদের ও রেনেসাঁসের পথপ্রদর্শকদের গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতে ও তাঁদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

সুভাষ বোস প্রথম যখন ১৯৩৮ সালে হরিপুরা সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তখন তিনি দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধতা করে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেসের দ্বার শ্রমিকশ্রেণীর কাছে উন্মুক্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন — সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে অকৃত্রিম বন্ধু। এই ঘোষণার ফলে একদিকে ব্রিটিশ সরকার অন্যদিকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আতঙ্কিত হয়। তার ফলে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে তিনি যাতে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে না পারেন সেজন্য দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে পাল্টা ক্যান্ডিডেট দেয়। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়। ত্রিপুরী অধিবেশনেই তাঁর হাত-পা বাঁধবার জন্য দক্ষিণপন্থীরা আনে কুখ্যাত পন্থ প্রস্তাব। সে প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি। সিপিআই তার বিরুদ্ধতা করেনি। সুভাষ বোস খুব দুঃখ করে বলেছিলেন — আমার পরাজয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতকতা এবং সিপিআই-এর তাদের সাথে অংশগ্রহণ। এরপরে এই পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী গান্ধীজির নির্দেশ মেনে নেতাজিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হত। কিন্তু গান্ধীজি কোন দিক থেকে সহযোগিতা না করায় তাঁকে শেষপর্যন্ত সভাপতির পদ ত্যাগ করতে হয় ১৯৩৯ সালের মে মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের একটি অধিবেশনে। এই সময়েও অবিভক্ত সিপিআই তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। পরে কংগ্রেস তাঁকে সাসপেন্ড করে। সে সময়েও সিপিআই দক্ষিণপন্থীদের সাথেই ছিল, সুভাষ বোসের পাশে দাঁড়ায়নি। বহিষ্কৃত অবস্থায় সুভাষ বোস যখন ভারতবর্ষের বামপন্থীদের একত্রিত করার জন্য লেফ্‌ট কনসলিডেশনের আহ্বান দেন এবং এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশে রামগড়ে পাল্টা বামপন্থীদের ঐতিহাসিক সম্মেলন আহ্বান করেন — তাতেও কিন্তু সিপিআই যোগ দেয়নি। এ সময়ে সুভাষ বোসকে সামনে রেখে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে সুযোগ এসেছিল — সুভাষ বোসের বার বার আকুল আবেদন সত্ত্বেও সিপিআই সাড়া না দেওয়ায় সেই সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। সুভাষ বোস জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু মার্কসবাদকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি — ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির শ্রেষ্ঠ অবদান মার্কসবাদ, বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার অবদান সোভিয়েট বিপ্লব, সোভিয়েট রাষ্ট্র, সোভিয়েট সংস্কৃতি। সুভাষ বোস নিজে সি পি আই-য়ের এই ভূমিকা দেখে দুঃখ করে বলেছিলেন — ভারতবর্ষে যারা কমিউনিস্ট বলে পরিচিত তাদের দেখে মনে হয় না তারা স্বাধীনতা চায়। তারপর তিনি বলেছিলেন — আমি মার্কস-লেনিনের বই পড়েছি, আমি জানি কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক।

অথচ চীনে সুভাষ বোসের মতোই একটি চরিত্র ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনকে সামনে রেখে মাও সে তুং-নেতৃত্ব একটা ফ্রন্ট করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে গণমুক্তির সংগ্রামে পরিণত করতে পেরেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি। সেদিন যদি সি পি আই এবং অন্যান্য বামপন্থীরা সুভাষ বোসের পাশে থাকত তাহলে সুভাষ বোসকে হয়ত দেশত্যাগ করতে হত না, তাহলে হয়ত '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে সুভাষ বোসকে আমরা পেতাম। এত বড় একটা সুযোগ সেদিন উন্মুক্ত হয়েছিল। ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন — ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। অথচ সে রাস্তা সিপিআই অনুসরণ করেনি। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেটা একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ছিল, নেতৃত্বহীন অবস্থায় যা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই অভ্যুত্থান সফল হলে দেশের চেহারাই পাল্‌টে যেত। এই কথাগুলো আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা বলছি; বলছি এইজন্যই যে আজ সিপিএম সেই কলঙ্কজনক অধ্যায়কে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আজকের দিনে প্রবীণদের বিস্মৃতির এবং নবীন প্রজন্মের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তারা হঠাৎ নেতাজি উৎসবের আয়োজন করছে। নেতাজি দিবসে তারা মোটরসাইকেলের র‍্যালি, কুচকাওয়াজ, আতশবাজি পোড়ানো, অফিসে অফিসে আলো জ্বালানো, ঝলমলে অনুষ্ঠান করে তাদের অপরাধ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিছক ভোটের দিকে তাকিয়ে আজকে নেতাজির নামটাকেও তারা ব্যবহার করছে। তারা চেষ্টা করছে এই কলঙ্কিত ইতিহাসটা দেশের নতুন প্রজন্ম যেন জানতে না পারে এবং নেতাজির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসাটা তারা নির্বাচনে ব্যবহার করতে পারে। এর বিরুদ্ধেই আজকে আমাদের প্রতিবাদ।

বর্ধমানে সারা ভারত ডি এস ও'র ৭ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন প্রাঙ্গণে ২৩ জানুয়ারি সকালে নেতাজিকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে ছাত্রছাত্রীরা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে যুদ্ধের সুযোগে জাপানের সাথে বোঝাপড়া করলেও আগাগোড়া নেতাজি ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছিলেন। হিটলারের কঠোর সমালোচনা তিনি করেছিলেন। এমন কথাও তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্বে আজকে দুটি ধারা — একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ, অন্যদিকে কমিউনিজম। হিটলারের পরাজয়ের দ্বারা কমিউনিজমের বিজয় সূচিত হবে। জার্মানি যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে তিনি তারও বিরুদ্ধতা করেছিলেন। এমনকী যুদ্ধে তিনি যখন পরাস্ত তখনও সিঙ্গাপুর থেকে শেষ বেতার ভাষণে বলেছিলেন — এখনো স্ট্যালিন জীবিত আছেন, গোটা বিশ্বের জনগণ তাঁর নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাঁর উপরে আগামীদিনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। এই ধরনের একজন মহান নেতা, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, কমিউনিজমের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, — তাঁর সাথে সিপিআই-এর, যার মধ্যে সিপিএম নেতারাও ছিলেন — আচরণ অত্যন্ত দুঃখজনক, নিন্দনীয় এবং সমালোচনার যোগ্য। এই কথাগুলি দেশের মানুষের জানা দরকার।

৫৫ বছর বাদে আজ সিপিএম নেতৃত্ব লেছেন — 'আমরা নেতাজির মূল্যায়নে ভুল করেছি।' তাও কী প্রশ্নে ভুল? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আই এন এ-র ভূমিকার মূল্যায়নে ভুল। কিন্তু তাঁরা উল্লেখ করেননি ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁদের কী ভূমিকা ছিল। পন্থ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে তাঁদের কী ভূমিকা ছিল। নেতাজিকে যখন পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে, যখন তাঁকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে তখন তাঁদের কী ভূমিকা ছিল। কেন তাঁরা নেতাজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে লেফ্‌ট কনসলিডেশনে যোগ দেননি? এসব প্রশ্নে তাঁরা নিরুত্তর। অথচ এগুলি বাদ দিয়ে শুধু 'আই এন এ-র ক্ষেত্রে আমরা ভুল করেছি' — এ কথা বলে ইতিহাসকে চাপা দেওয়া যাবে না। লেনিন বলেছেন — ভুল স্বীকার করাটাই বড় কথা নয়, কেন ভুল করেছ — তার কারণ বলো, তার কারণ খোঁজো এবং তাকে সংশোধন করো। সেই কারণ খুঁজতে গেলে, বুঝতে গেলে যে সত্য বেরিয়ে আসে তাহল সিপিএম ও পূর্বতন সিপিআই কোনদিনই যথার্থ মার্কসবাদী দল ছিল না। গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে মার্কসবাদকে তারা বার বার কলঙ্কিত করেছে। সুভাষ বোস একদিন দুঃখ করে বলেছেন — কমিউনিজমের মতো এমন একটা বিশ্বজনীন মানবিক আদর্শ ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না এজন্যই যে, এদেশে যারা কমিউনিস্ট বলে পরিচিত তাদের কর্মপদ্ধতি এবং কলাকৌশল এইরকমই যে তারা মানুষকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে শত্রু করে তোলে।

আমরা নেতাজির জন্মদিবস প্রতি বছর উদ্‌যাপন করি, তাঁর জীবনসংগ্রামকে জনগণের সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আজকের ছাত্র-যুবকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নেতাজির একটা ঐতিহাসিক বক্তব্য আছে। তিনি বলেছিলেন — ছোটবেলায় ভেবেছিলাম ইংরেজকে তাড়ালেই আমাদের কাজ শেষ হবে। এখন বুঝতে পারছি ইংরেজকে তাড়ানোর পরেও ভারতবর্ষে আর একটা বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। সে বিপ্লব অবশ্যই পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই আমাদের সে বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। ২৩ জানুয়ারি এই বক্তব্যই জনগণের কাছে আমরা নিয়ে যাই। আমরা আলোচনা সভা, ব্যাজ পরিধান নেতাজির বাণী সম্বলিত প্রদর্শনী ইত্যাদির দ্বারা তাঁর সংগ্রামকে জনগণের কাছে নিয়ে যাই। আমরা মনে করি, দেশের জনগণ, ছাত্র যুবকদের কাছে সত্য ইতিহাসটা যাওয়া উচিত এবং নেতাজিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৩০ জানুয়ারি, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ২৪ সংখ্যা ৮

সরকারের হৃদয়বৃত্তিও পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত

৪ জানুয়ারি, ২০০৪ দিনটা ছিল, 'পোলিও রবিবার'। খবরটা বেরিয়েছে ঠিক তার আগের দিন, ৩ জানুয়ারি। খবর হিসেবে হয়ত জবর কিছু নয়। অজস্র অপ্রাপ্তি আর অবহেলার বহু খবরের মধ্যে আরও একটি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কদমডিহা গ্রামের অতুল মাহাতো বলতে গেলে প্রায় অন্ধ। বছর তিরিশ বয়সের এই দিনমজুর অতুল গত ১৬ ডিসেম্বর কুকুরের কামড় খেয়ে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে গিয়েছিলেন ইঞ্জেকশন পাওয়ার আশায়। তিনি ইঞ্জেকশন পাননি, পেয়েছেন একটা নম্বর — ১৭৭। অর্থাৎ ওয়েটিং লিস্টে ১৭৬ জনের পর তার নাম রয়েছে। তাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করে বেশ কয়েকবার ঘোরানোর পর ২৭ ডিসেম্বর বলে দেওয়া হয়েছে, বাইরে থেকে ইঞ্জেকশন কিনে আনতে। নুন আনতে যার পান্তা ফুরায় সেই অতুল মাহাতোর পক্ষে দামী ঐ ইঞ্জেকশন কেনা সম্ভব হয়নি। হয়ত জলাতঙ্কের শিকার হয়ে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে অতুলকে। ঠিক তার পরে পরেই কোনও এক 'পোলিও রবিবার' যদি বাড়ি বয়ে অতুলের শিশুকে পোলিও খাওয়াবার তোড়জোড় করা হয় তাহলে অতুলের মূর্খ বিধবা বউ কী চোখে দেখবেন উপযাচকদের?

এই যে পালস্ পোলিও কর্মসূচি বারংবার মুখ থুবড়ে পড়ছে তার অন্যতম প্রধান কারণই হলো, সরকারের প্রতি মানুষের অনাস্থা এবং অবিশ্বাস। হাজার রকম সমস্যার যাঁরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত জেরবার হচ্ছেন তাদেরকে যদি কোনও একটা সমস্যার বিষয়ে খুব বেশি করে বোঝাতে চাওয়া হয় তাহলে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দেবেই। মেদিনীপুরের এগরা থেকে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া, বীরভূমের রামপুরহাট থেকে পুরুলিয়ার আদ্রা সর্বত্রই একই চিত্র। কোথাও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অভিভাবকরা নিজ শিশুদের যত্রতত্র লুকিয়ে রেখেছেন, কোথাও বা গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে দাবি আদায়ের হাতিয়ার করেছেন পালস্ পোলিওকে। পোলিও প্রতিরোধ করতে গিয়ে মানুষের প্রতিরোধের সামনে পড়তে হচ্ছে উন্নয়ন-গর্বী সরকারকে। উন্নয়নের দাবিতে নির্বাচন বয়কট প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু সরকারি কোনও জাতীয় কর্মসূচি বয়কট এই প্রথম দেখা গেল। পালস্ পোলিওকে সামনে রেখে যেসব দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হচ্ছে সেগুলো এমন কিছু অ-সাধারণ বা অ-পূরণীয় নয়। আজও যে মানুষকে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, সেতু বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মত মামুলি দাবি আদায় করতে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও বাজি ধরতে হচ্ছে, এটাই বিস্ময়ের এবং পরিতাপের বিষয়। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে এই ধরনের দাবি ওঠার সাথে সাথে উন্নয়নের সরকারি ফানুসটাও ফুটো হয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোকর্ণীর বাসিন্দারা চেনেন না বর্ধমানের অর্জুনডিহির বাসিন্দাদের। কিন্তু উভয় গ্রামের বাসিন্দাদের সমস্যা একই। রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয়। ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী বিশিষ্ট অর্জুনডিহির একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি ভেঙে পড়েছে ২০০০ সালের বন্যায়। তারপর তিন তিনটে বছর পেরিয়ে গেলেও গৃহনির্মাণ আর হয়ে ওঠেনি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল বসে খোলা আকাশের নীচে। রোদে জলে দুর্ভোগের একশেষ। বহু আবেদন নিবেদনে কাজ না হওয়ায় অর্জুনডিহির মানুষ বাধ্য হয়ে পালস্ পোলিও বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (আ.বা.২/১)। গোকর্ণী বা অর্জুনডিহিই শুধু নয়, একই ধরনের অভাব-অভিযোগ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ রাজ্যের সর্বত্র রয়েছে।

শুধুমাত্র রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ বা বিদ্যালয়ের মধ্যেই মানুষের ক্ষোভ সীমাবদ্ধ নেই। যে শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে এত উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে, যাদেরকে পোলিওর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এত জেদাজেদি সেই শিশুরাই অন্য আর একটা সাধারণ অসুখে আক্রান্ত হলেও চিকিৎসা পাচ্ছে না। সুচিকিৎসা দূরের কথা, ন্যূনতম চিকিৎসাও তাদের নাগালের বাইরে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিও ধুঁকছে। এই তো পালস্ পোলিওর ভরা মরসুমেই খবর বেরিয়েছে, "সিউড়ি একনম্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন গরু বাছুরের বিচরণ ক্ষেত্র।" উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বার তিনেক পুরস্কার পেয়েছিল সে নিজেই এখন অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে (বর্তমান ৭/১)। পালস্ পোলিওর তিন দিন আগের এক খবরে দেখা যাচ্ছে, "স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও পরিষেবা পান না দেউলপুরের মানুষ।" হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার লক্ষাধিক মানুষের ভরসাস্থল ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এখন 'ভূতের বাসা' (আ.বা.৩১/১২/০৩)। এইভাবে প্রায় প্রতিদিনই প্রসূতি বা শিশু-মৃত্যুর মতই হাসপাতালগুলিরও মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। একটা সময় পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকার কোন্ কোন্ হাসপাতাল বন্ধ রয়েছে তার হিসেব রাখতে হতো, এখন হিসেব রাখতে হয় কোন্ কোন্ হাসপাতাল খোলা রয়েছে তার।

শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিই যে স্বাস্থ্যসঙ্কটে ভুগছে তা-ই নয়, বিশেষ বিশেষ রোগ চিকিৎসার বড় বড় হাসপাতালগুলিকেও আজ সরকার লাটে তুলতে বদ্ধপরিকর। যেমন বীরভূমের দুবরাজপুরের ৩০০ শয্যার টি বি স্যানেটোরিয়ামটি নিজেই এখন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। (বর্তমান ৬/১)। "স্যানেটোরিয়ামের নিজস্ব ল্যাবরেটরি এবং এক্স-রে রুম থাকলেও গত আড়াই বছর ধরে এখানে এক্স-রে হয় না শুধুমাত্র ফিল্ম এবং ডেভেলপারের অভাবে।" তার মানে, মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের পর্যাপ্ত সদিচ্ছাই নেই। এর আগেও তাই খোদ কলকাতার ৮০ বছরের পুরোনো সাড়ে সাতশো শয্যার কে এস রায় যক্ষা হাসপাতালটি একটি বেসরকারি সংস্থাকে বিলিয়ে দিতে দেখা গেছে। দেখা গেছে দফায় দফায় হাসপাতালের চার্জ বাড়িয়ে গরিব মানুষের হাসপাতালের দিকে পা বাড়াবার রাস্তা বন্ধ করতে।

এই যদি হয় সরকারি উদ্যোগের নমুনা তাহলে সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সন্দিগ্ধ তো হবেনই। কারও বিশ্বাসযোগ্যতা একবার নষ্ট হয়ে গেলে তার উপযাচিত কার্যক্রম সম্পর্কে আরও বেশি মাত্রায় ভ্রমোৎপাদিত হতেই পারে। কোথাও কোথাও পালস্ পোলিওকে 'বুশের ওষুধ' বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। ৯ নভেম্বরের পালস্ পোলিওর প্রাক্কালে লালগোলায় শীতেশনগর গ্রামে কয়েকজন যুবক মসজিদের মাইকে এই ধরনের প্রচার করে। শেষে অতিরিক্ত জেলা শাসক, সভাপতি, বিডিও সাহেব এবং অবশ্যই থানা পুলিশ গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। জানা গেছে, অপপ্রচারকদের মধ্যে রাজ্যের প্রধান শাসকদলের স্থানীয় কর্মীরাও ছিলেন। তা না থাকলে অবশ্য গোটা গ্রামকে বিভ্রান্ত করা সম্ভবও নয়। ওখানে প্রধান শাসক দলের, অন্য কোথাও হয়ত অন্য কোনও দলের কেউ একই ভূমিকা পালন করছেন। প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হলো, যারা এই অপপ্রচার করছেন তারা কি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে তা করছেন, নাকি নেতৃত্বকারী ওই রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেরাই বিভ্রান্তির শিকার? নিজেদের বিশ্বাসকেই বিশ্বাস-করতে-প্রস্তুত অন্যদের কাছে গ্রহণীয় করছেন। যেখানে টেলিফোনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণেশকে দুধ খাওয়ানোর হিড়িক পড়ে যায় সেখানে অশিক্ষিতদের মধ্যে এই ধরনের বিভ্রান্তি কি খুবই অস্বাভাবিক !

পথ-ঘাটের আলোচনায় টের পাই, কারণানুসন্ধানে অপারগ বা অনিচ্ছুক কিছু শিক্ষিত মানুষ পালস্ পোলিওর ব্যর্থতার জন্য একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দায়ী করেন। আসলে তাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে খাদ হয়ে মিশে আছে সাম্প্রদায়িক ভাবনার বীজ যা কিনা নানা সময় নানাভাবে অঙ্কুরিত হয়ে মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। তা নাহলে তারা ওই ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দায়ী করার আগে বার কয়েক ভাবতেন। দেখতে পেতেন আমাদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী পোলিও-মুক্ত বাংলাদেশের দুর্ভাবনা। বুঝতে পারতেন, 'পূর্ণ সাক্ষর' বর্ধমান জেলাতেও কেন হাজার হাজার শিশু থেকে যায় পোলিও না খাওয়া। বুঝতে পারতেন, গ্রামাঞ্চলের কর্দমাক্ত পথেই শুধু নয়, শহরাঞ্চলের পাকা সড়কেও কেন বসে যাচ্ছে পোলিও-রথের চাকা।

যেখানে প্রতি বছর বন্যায় ভেসে যায় হাজার হাজার ঘরবাড়ি, খরায় পুড়ে যায় অগণিত সংসার, যেখানে গরমে ধুঁকতে ধুঁকতে মানুষ মরে যায়, মানুষ মরে যায় শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে, সেখানে মানুষকে সরকারি মমত্ব বিশ্বাস করানো শক্ত। শীতার্ত মানুষকে একটু বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বাঁচানোর মত উষ্ণতাও যাদের বুকের মধ্যে অবশিষ্ট নাই তারাই যখন ওই মানুষগুলির শিশুদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় প্রচুর বাক্য ব্যয় করেন তখন তা মান্যতা পায় না। পালিশ চেহারার সরকারি কর্মীরা শেষে পুলিশ দিয়ে পোলিও খাওয়াচ্ছেন। মানুষের সাথে সরকারের আরও বেশি দূরত্ব সূচিত হচ্ছে। সরকারও কোনও সদিচ্ছা বা দায়বদ্ধতার বোধ থেকে এসব (সাক্ষরতা, পোলিও অভিযান ইত্যাদি) করে না আর। যতক্ষণ বহিরাগত অর্থের (ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি) যোগান থাকে ততক্ষণ নড়নচড়ন। অর্থাগম শেষ তো অভিযানও শেষ।

(মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত 'ঝড়' পত্রিকা, ১২-১৮ জানুয়ারি থেকে)

কলকাতা বইমেলায়

গণদাবী

স্টল নং — ১১৭

বইমেলায় মনীষীদের প্রতি অসম্মান করা হল

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"বইমেলায় বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত ভ্রাম্যমান বুক স্টলে রবীন্দ্রনাথ-নেতাজীর পাশে জ্যোতি বসুর মোমের মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং নিন্দনীয়।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিজেদের স্বকীয় মহান কীর্তির দ্বারা দেশবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। অন্যদিকে মার্কসবাদের বিকৃতির প্রতিনিধি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের স্বার্থে শ্রমিক-কৃষক-জনগণের স্বার্থকে পদদলিত করে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন পরিচালনা করে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছেন এবং জনগণের দ্বারা ধিক্কৃত হচ্ছেন। ফলে উপরোক্ত স্বনামধন্য মহান ব্যক্তিত্বদের পাশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে স্থান দেওয়া খুবই ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক এবং মনীষীদের অসম্মান করা — যা এই রাজ্যের জনগণ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

সরকারি দলের কাছে নতি স্বীকার করে বইমেলা কর্তৃপক্ষ এই ধরনের গর্হিত সিদ্ধান্ত নিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।"

লাতিন আমেরিকা জুড়ে গণবিক্ষোভ

ছয়ের পাতার পর

১২ ও ১৩ জানুয়ারি দুদিনব্যাপী এক শিখর সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ শিখর সম্মেলনের উদ্যোক্তা স্বয়ং মার্কিন প্রশাসন।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোকে নিয়ে গড়া উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (NAFTA)-র তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে লাতিন আমেরিকার খেটে খাওয়া মানুষ বুঝে গেছে যে NAFTA-রই অনুরূপ FTAAও হচ্ছে একটি শোষণমূলক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা এবং আমেরিকা তার নিজের স্বার্থেই এই মুক্তবাণিজ্য এলাকা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। স্বভাবতই এ কারণেই লাতিন আমেরিকার খেটে খাওয়া মানুষ FTAA-কে রুখতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্মেলনের দুদিনই তারা সম্মেলনস্থলের বাইরে FTAA ও আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা ও মার্কিন পতাকা দাহ করা হয়েছে। FTAA ভেঙে দেবার দাবি জানানোর পাশাপাশি ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিও তোলা হয়েছে। বিক্ষোভাকারীদের হঠাতে গিয়ে রায়ট পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। (এপি ও এ এফ পি, ১৪-১-০৪)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net